একজন ঘষেটি বেগম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অর্থনীতি

ড. এ. কে. এনামুল হক

চলছে এসএসসি পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষা কেমন হচ্ছে, তা এখন আর পরিবারে আলোচনার বিষয় নয়। আলোচনা এখন কারো কাছে দীর্ঘশ্বাসের। আহা প্রশ্নটা পাওয়া গেল না। আমার পরিশ্রম বৃথা গেল, কারণ সহপাঠীদের চেয়ে বেশি পড়ালেখা করেও আমি পারলাম না। কারো কাছে এটি শিক্ষা ব্যবস্থায় ধসের সূচনা মাত্র। কারো কাছে একটি উত্তর— কোথায় পাওয়া যাবে প্রশ্নটি? কারো কাছে ভাগ্যিস আমার ছেলে এ দেশে পড়ছে না! আবার কেউ কেউ ভাবছেন আগামী পরীক্ষার প্রশ্ন কীভাবে সংগ্রহ করা যায়, তার সূত্রটা কোথায় পাওয়া যাবে? কেউ বলছেন না প্রশ্ন কঠিন না সহজ হয়েছে। গুগলকে জিজ্ঞেস করলাম, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন কোথায় পাওয়া যায়? উত্তরে গুগল ২ লাখ ১৮ হাজার লিংকের একটি পেজ ধরিয়ে দিল। বুঝলাম ফাঁস করা প্রশ্ন সম্পর্কে গুগল ওয়াকিবহাল নয়। আমার এক সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলাম কারা করছে বলে মনে হয় তোমার? উত্তরে বলল, ঘষেটি বেগমের কাজ। কে এই ঘষেটি বেগম, তা জানতে চাইলাম না। তবে বুঝতে পারলাম রাঘব বোয়ালদের কাজ। কিন্তু আমাদের সংবাদপত্র বলছে অন্য কথা। প্রতিদিন এসএসসি শিক্ষার্থীকে জেলে পোরা হচ্ছে। তাদের অপরাধ? তাদের মোবাইলে পরীক্ষার প্রশ্ন পাওয়া গেছে। কে অপরাধী? কে জেলে গেল? কে টাকা পেল? তা শেষ পর্যন্ত হয়তোবা বের হবে না। তাই সে বিষয়ে নাক গলানোর কোনো ইচ্ছা হচ্ছে না।

আমাদের সময়ে (সত্তরের দশকে) একটি হুজুগ ছিল, সে সময় উত্তর ফাঁস হতো। নকলের উৎসব হতো। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নকলের উৎসাহ না থাকলেও সেখানে নকল করতে গিয়ে বহু শিক্ষার্থী শাস্তি পেয়েছে। তাতে তা থেমে যায়নি। আমাকে একবার এক আমলা-রাজনীতিবিদ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার এলাকার কলেজটির রেজাল্ট কেমন হবে? [তিনি জানতেন আমি ছিলাম বিএ পরীক্ষার একজন টেবুলেটর] তাকে বললাম, বেশ নকল হয় ওখানে। কি করে জানলেন? খুব সহজ, ছাত্ররা খাতায় ভালো মার্ক পাচ্ছে। অথচ যেদিনই কোনো পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হচ্ছে, সেদিনের পরীক্ষায় সবাই খারাপ করছে! তিনি হেসে বলেছিলেন, আমারও তাই মনে হচ্ছিল কারণ কলেজটির বিজ্ঞাপনে বলা ছিল পরীক্ষায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। সেই যুগ থেকে এই যুগ ভিন্ন কিন্তু ঘটনা প্রায় একই। তখন পরীক্ষার হলে উত্তর ফাঁস হতো আর এখন পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়।

পত্রিকা ও গভীর রাতের টেলিভিশন বেশ তৎপর সমাধান খুঁজতে কিন্তু ঘষেটি বেগমের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি নিশ্চিত কেউ পাবেও না। আবার কে এই ঘষেটি বেগম, তা জানা গেলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস থামবে না। ঘষেটি বেগম বদলে আসবে মীর জাফর! অতএব ভাবতে হবে আর কীভাবে এ অপরাধ বন্ধ করা যায়। গভীর রাতের টিভি শোতে নানা বুদ্ধি বেরিয়ে আসছে। সরকার কিছুটা নির্বিকার, দুর্নীতি নিয়ে সোচ্চার সরকারের নীরবতাকে সুধীজনের কেউই ভালোভাবে দেখছেন না। আশা করি সরকার আর দেরি না করে তা বুঝতে পারবে। কথায় বলে সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।

একজন বলছিলেন, এসব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের ফসল। সমাজে সব মনুষ্যজীবের নৈতিকতায় অধঃপতন ঘটেছে বলেই শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করছেন, 'প্রশ্ন পেয়েছ তো?' মনে করতে পারেন এতে শিক্ষকের মান গেল! তা নয় অনেক ক্ষেত্রে আমার ভালো ছাত্রটি শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় খারাপ করবে, তা বহু শিক্ষক মানতে পারেন না। হতাশা থেকে আত্মহননের পথ বেছে নেয়ার মতো। কদিন আগে দেখেছেন ফ্লোরিডায় ছাত্রদের গুলির হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে এক শিক্ষক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এমন ঘটনা সর্বত্রই পাবেন। প্রকৃত শিক্ষক তার ছাত্রকে রক্ষা করতে কুণ্ঠা করবেন না। তবে নৈতিক অবক্ষয় কেবল এই প্রজন্মেই ঘটেনি।

অপরাধ মানুষ নানা কারণে করে। বাধ্য হয়েও অনেকে অপরাধ করে। মানুষ না জেনে অপরাধ করে। আর অপরাধ যখন সামাজিকভাবে পুরস্কৃত, তখন অপরাধ আর অপরাধ থাকে না। পাপ ক্রমে পুণ্যে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে ১৪-১৫ বছরের শিশুদের জেলে পুরতে কি কারো গায়ে লাগে না? একবারও ভেবেছেন, এই শিশুর অপরাধ কী? একটুখানি লোভই তো! তার চেয়ে বড় লোভীরা আড়ালেই রইল আর ছোট্ট শিশুটিকে জেলে ঢোকানো হচ্ছে! এই তো সেদিন এক সচিব তার বয়স এফিডেভিড করিয়ে কমিয়েছেন চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়াতে! তিনি করেছিলেন মাত্র এক বছরের চাকরি জীবন বাড়ানোর জন্য আর এই শিশু? সে তো করছে তার জীবন বাঁচাতে। তাকে সারা জীবন পেছনে থাকতে হবে কারণ সে জেনেও প্রশ্নপত্রটি দেখতে চায়নি! পারবেন আপনি না দেখে থাকতে? আমি অবশ্য এ-ও জানি যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তা পারবে, তবে তেমন মনোবলের মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা। কেন মনে নেই কেবল পদের লোভে কত সরকারি কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধার ভুয়া সনদ বের করেছেন? আবার কত কর্মকর্তা বয়স কমাননি বলে শেষ পর্যন্ত সচিব হতে পারেননি। কারো কি শাস্তি হয়েছে? জেল হয়েছে? না হয়নি! ঘষেটি বেগমদের হবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিশেষ কিছু মন্ত্রণাদাতাদের প্ররোচনায় গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে। পরীক্ষা, কোচিং, ফেসবুক, নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস আর ঘষেটি বেগমদের কাছে আমরা বন্দি হয়ে গেছি। রক্ষা করুন সবাইকে। কোমলমতি শিশুদের নাচ-গান, খেলাধুলা, বিজ্ঞানচর্চা, গল্প পড়া, কবিতাচর্চা এ ধরনের সৃজনশীল কিছু করার সময় বের করে দিন। এমন পরীক্ষা থাকা না থাকা সমান। স্কুলকে বলুন, তাদের পরীক্ষা তারাই নিক। কোনো ক্ষতি হবে না। স্কুল কর্তৃপক্ষকে নজরদারিতে আনুন। শিশুকে নয়

জন্মদিন নিয়েও এমন অনেক কথা চালু আছে। জন্মদিন পরিবর্তনকে এখনো অনেকে অপরাধ মনে করেন না। আমার পরিচিত এক মুফতিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ধরুন আমার জন্মতারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। আমার পাসপোর্টে ভুয়া তারিখ বসানো আছে। আমি সেই মিথ্যে জন্মদিনের পাসপোর্ট নিয়ে হজ করে এলাম। আমার হজ কি মিথ্যা হবে? বললেন, মিথ্যা কি আমি নিজে থেকে তৈরি করেছি কিনা? বললাম, ধরুন আমি নিজ হাতে করিনি কিন্তু আমি জানি তা মিথ্যা। তিনি চুপ করে গেলেন।

সেদিন পত্রিকায় আরো এক অদ্ভুত বিষয় দেখলাম। ঢাকায় কোনো এক ব্যাংকের এমডি তার নাম এফিডেভিড করে বদলিয়েছেন যেন তিনি অন্য একটি ব্যাংকের এমডি পদে যোগদান করতে পারেন। কই তাকে তো কেউ অপরাধী মনে করেনি। পত্রিকায় রসাত্মক সংবাদ এসেছিল মাত্র। বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা অর্থ মন্ত্রণালয় কি তার বিরুদ্ধে কিছু করেছে? এই রকম একটি তাহলে কি আমাদের নৈতিকতা শিক্ষায় জোর দেয়া উচিত। আমার মতে, করতে পারেন তবে কাজ হবে না। কারণ নৈতিকতা সৃষ্টি করা সহজ বিষয় নয়। তবে আমার কাছে কয়েকটি সমাধান রয়েছে। প্রথমটি হলো পরীক্ষা তুলে দিন। কি হবে পরীক্ষা নিয়ে? এমনিতেই এখন আর কেউ পরীক্ষায় ফেল করে না। বাবা-দাদা-মামাদের নাম দেখে পাস করিয়ে দিন। রাজার ছেলে রাজাই হবে। কোনো অপরাধ হবে না। সমাজ মেনে নেবে, যেমনটি সমাজ মেনে নিয়েছে ঘষেটি বেগমকে। শুধু সরকার নয় আমাদের বিরোধী দলগুলোও নিশ্চুপ। সবাই ঘষেটি বেগমের আত্মীয়! দ্বিতীয় সমাধান করা যাবে অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী। পরীক্ষার মূল্য কমিয়ে দিন। সস্তা জিনিসের নকল হয় না। দেখবেন রোলেক্স ঘড়ির নকল হয়। কিন্তু চাইনিজ ঘড়ির নকল হয় না। ১০০০ টাকার নোট নকল হয় কিন্তু ২ টাকার নোট নকল হয় না। প্রশ্ন করতে পারেন, পরীক্ষার মূল্য আবার কি? একটি পরীক্ষার ফলাফলকে পরবর্তী কোনো স্তরে, কোথাও মূল্যায়ন করবেন না। দেখবেন নকল হবে না। নকলের কোনো প্রয়োজন হবে না। আমার এক বন্ধু (এখন বেঁচে নেই) একবার বলেছিল, ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার জন্য পড়তে হয়। সেকেন্ড ক্লাস এমনিতেই পাওয়া যায়। জিপিএ ৩.০ পেলেই তাকে উচ্চশিক্ষায় যেতে দিন। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কিংবা অন্য যেকোনো পরীক্ষায় কেবল ন্যূনতম মানটি রাখুন আর বলুন তোমরা তোমাদের ছাত্র বা প্রার্থী বাছাই করে নাও। কে শেষ পর্যন্ত ভর্তি হবে আর কে হবে না তার সঙ্গে এসএসসি বা এইচএসসির জিপিএর সম্পর্ক তুলে দিন। সবাই তো এমনিতেই ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে, তার ওপরই নির্ভর করুন। দেখবেন সাধারণ শিক্ষায় ছলচাতুরি কমে গেছে। কেউ নকলে উৎসাহী হবে না। বহু জিপিএ ৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় টিকছে না। আমরা তা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। অতএব পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুদের জীবন অতিষ্ঠ করার কোনো মানে হয় না। তাদের শৈশব ফিরিয়ে দিন, তাদের কৈশোর ফিরিয়ে দিন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিশেষ কিছু মন্ত্রণাদাতাদের প্ররোচনায় গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে। পরীক্ষা, কোচিং, ফেসবুক, নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস আর ঘষেটি বেগমদের কাছে আমরা বন্দি হয়ে গেছি। রক্ষা করুন সবাইকে। কোমলমতি শিশুদের নাচ-গান, খেলাধুলা, বিজ্ঞানচর্চা, গল্প পড়া, কবিতাচর্চা এ ধরনের সৃজনশীল কিছু করার সময় বের করে দিন। এমন পরীক্ষা থাকা, না থাকা সমান। স্কুলকে বলুন তাদের পরীক্ষা তারাই নিক। কোনো ক্ষতি হবে না। স্কুল কর্তৃপক্ষকে নজরদারিতে আনুন। শিশুকে নয়।

বলতে পারেন, আরে বাহ শিক্ষকরা তো এমনিতেই স্কুলে পড়াচ্ছেন না। কোচিং নিয়ে ব্যস্ত! তাদের কাছে ক্ষমতা দিলে তো সবই যাবে! উত্তর দুইভাবে দেয়া যায়। এক. অন্যদের হাতে এই দায়িত্ব তুলে দিয়ে কী খুব ভালো হয়েছে? দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। দুই. স্কুলের মূল্য কমিয়ে দিন। অভিভাবককে স্বাধীনতা দিন। তাদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিন। বলুন আপনার শিশুর ভালো আপনারই হাতে। যদি দেখেন স্কুল পড়াচ্ছে না আর তা শুধরাতে আপনাকে কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে, তবে স্কুল বাদ দিয়ে কোচিং সেন্টারেই শিশুকে রাখুন। সেখান থেকেই সে পরীক্ষা দেবে। আর স্কুলকে বলুন ছাত্র না থাকলে স্কুল থাকবে না। যার অপরাধ, তাকে শাস্তি দিন। যে শিক্ষকরা ক্লাসে পড়াচ্ছেন না, তাদের শাস্তি দিন। ছাত্রকে পরীক্ষার নামে শাস্তি দেবেন না। দেখবেন দেশে শিশুরা হাসছে, খেলাধুলা করছে। ভালো ক্রিকেটার হবে, ফুটবলার হবে, বিজ্ঞানী হবে। আরো দেখবেন তখন শিক্ষকরা ক্লাসে মনোযোগ দিচ্ছেন, কারণ তা না হলে আমি আমার সন্তানকে স্কুল আর কোচিং সেন্টার দুই স্থানে না কোচিং সেন্টারেই নিয়ে যাব। তার জীবন নষ্ট করব না। অভিভাবক হিসেবে তাকে শুধু প্রাণ নয় জীবন তৈরি করার দায়িত্ব আমার, সরকারের নয়। সরকার আমার হাত-পা বেঁধে আমার সন্তানের জীবন নষ্ট করছে। আমার স্বাধীনতা চাই। আমি ঠিক করব, আমার সন্তানকে কোথায় পড়াব। এক জায়গায়, দুই জায়গায় নয়। তবে হ্যাঁ, যেখানে কোচিং সেন্টার নেই, সেখানে কী হবে? স্কুলের শিক্ষকরা কি সেখানে পড়াতে বাধ্য হবেন? সেখানে অনলাইন কোচিং চালু করুন। ডিজিটাল বাংলাদেশে এখন খান একাডেমির মতো স্কুল তৈরির সময় এসেছে। এসব ডিজিটাল স্কুলকে পড়াতে দিন, স্বীকৃতি দিন। দেখবেন আপনার শিশুকে স্কুলে নেয়ার জন্যই তখন শিক্ষকরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা দায়িত্ববান হবেন, কারণ তা না হলে স্কুলে ছাত্র থাকবে না। আর ছাত্র না থাকলে শিক্ষকের প্রয়োজন হবে না। সরকারের দায়িত্ব স্কুল চালু রাখা নয়, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দেবে, যেখানে শিক্ষার্থী থাকবে, সেখানেই থাকবে সরকারের সহায়তা। অন্য কোথাও নয়।

লেখক : অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট